Live MCQ

সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

SCIENCE EXPERT

বিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারি ধাপের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির সহায়ক বই

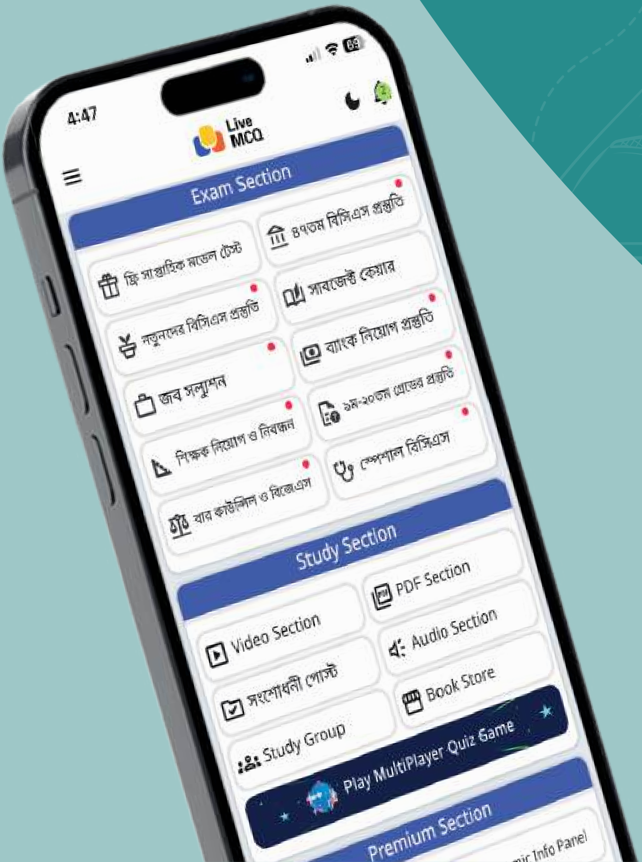

Live Publications™

সূচিপত্র

Part-A: ভৌত বিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভৌত বিজ্ঞানের উন্নয়ন	০১
অধ্যায়-১: পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা	**১-৮**
পদার্থবিজ্ঞানের শাখা	০১
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান	০২
পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকজন স্মরণীয় পথিকৃৎ	
পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার	০৬
অধ্যায়-২: ভৌত রাশি ও পরিমাপ	**৯-১৭**
রাশি	০৯
রাশির পরিমাপ	১০
পরিমাপের যন্ত্রপাতি	১২
পরিমাপের ত্রুটি	১৪
অধ্যায়-৩: কাজ, ক্ষমতা, শক্তি ও শক্তির রূপান্তর	**১৮-২৭**
কাজ	১৮
ক্ষমতা	
শক্তি	১৯
শক্তির রূপান্তর	
যান্ত্রিক শক্তি	২০
পারমাণবিক শক্তি	
নবায়নযোগ্য শক্তি ও অনবায়নযোগ্য শক্তি	২৩
নবায়নযোগ্য শক্তির কয়েকটি উৎস	
অধ্যায়-৪: স্থিতি, গতি ও বল	**২৮-৩৪**
স্থিতি	২৮
গতি	
গতির প্রকারভেদ	
নিউটনের গতিসূত্রসমূহ	৩০
জড়তা	
বল	৩১
ভরবেগ	
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	৩২
ঘর্ষণ	
স্থিতিস্থাপকতা	
অধ্যায়-৫: বস্তুর উপর চাপের প্রভাব	**৩৫-৪০**
ঘনত্ব	৩৫
চাপ	৩৬
বায়ুমণ্ডলের চাপ	
প্লবতা	
আর্কিমিডিসের নীতি	৩৭
পৃষ্ঠটান	
কৈশিক ক্রিয়া	৩৮
সান্দ্রতা	
অধ্যায়-৬: তরঙ্গ ও শব্দ	**৪১-৫০**
সরল ছন্দিত গতি	৪১
তরঙ্গ	
শব্দ	৪৩
শব্দের প্রতিধ্বনি	৪৪
শ্রাব্যতার পাল্লা, শব্দোত্তর তরঙ্গ, শব্দেতর তরঙ্গ	৪৫
শব্দের তীব্রতা	৪৬
টানা তারের আড় কম্পন	৪৭
অধ্যায়-৭: মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ	**৫১-৫৬**
কেপলারের সূত্র	৫১
নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র	
অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ ও মুক্তিবেগ	৫২
ভর ও ওজন	
পড়ন্ত বস্তুর সূত্রসমূহ	৫৩
সরল দোলক	
অধ্যায়-৮: আলো	**৫৭-৭৫**
আলো সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব	৫৭
তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালি	৫৮
দৃশ্যমান আলো	৫৯
আলোর প্রতিফলন	৬০
প্রতিবিম্ব	৬১
দর্পণ	
সমতল দর্পণ	
গোলীয় দর্পণ	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলোর প্রতিসরণ	৬৩
সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন	৬৪
আলোর বিচ্ছুরণ	৬৫
আলোর বিক্ষেপণ	৬৬
আলোক যন্ত্রপাতি	
লেন্স	৬৮
রৈখিক বিবর্ধন	৬৯
মানুষের চোখ ও ক্যামেরা	৭০
অধ্যায়-৯: তাপ ও তাপগতিবিদ্যা	**৭৬-৮৯**
তাপ	৭৬
তাপ সঞ্চালন	
তাপধারণ ক্ষমতা, আপেক্ষিক তাপ, সুপ্ত তাপ	৭৭
পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব	৭৮
তাপমাত্রা বা উষ্ণতা	৭৯
পরমশূন্য তাপমাত্রা, প্রমাণ তাপমাত্রা, প্রমাণ চাপ ও পানির ত্রৈধ বিন্দু	
তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল	
পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম	৮০
গ্যাসের সূত্রাবলি	৮১
তাপগতিবিদ্যা	৮২
তাপ ইঞ্জিন	৮৩
প্রত্যাবর্তী ও অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া	৮৪
অধ্যায়-১০: তড়িৎ	**৯০-১০৩**
স্থির তড়িৎ	৯০
আধান	
তড়িৎ বল ও কুলম্বের সূত্র	৯১
তড়িৎ ক্ষেত্র, তড়িৎ তীব্রতা ও বিভব	
চল তড়িৎ	৯২
তড়িৎ প্রবাহ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তড়িৎ পরিবাহিতা	৯৩
ব্যান্ড তত্ত্ব	
তড়িৎ বর্তনী	৯৪
রোধ	৯৫
ওহমের সূত্র	৯৬
তড়িৎ চালক শক্তি, তড়িৎ ক্ষমতা ও তড়িৎ শক্তি	
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৯৭
অধ্যায়-১১: চৌম্বক ও তড়িৎ চৌম্বক	**১০৪-১১১**
চুম্বক	১০৪
চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ	১০৫
তড়িৎ চৌম্বক	১০৬
তড়িৎ চুম্বক আবেশ	
বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া	১০৭
মোটর	
জেনারেটর	১০৮
ট্রান্সফর্মার	
অধ্যায়-১২: ইলেকট্রনিক্স	**১১২-১১৭**
অ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড ইলেকট্রনিক্স	১১২
অর্ধপরিবাহী	১১৩
ডায়োড	১১৪
ভ্যাকুয়াম টিউব	
ট্রানজিস্টর	১১৫
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট	
অধ্যায়-১৩: এক্স-রে ও তেজস্ক্রিয়তা	**১১৮-১২২**
এক্স-রে	১১৮
তেজস্ক্রিয়তা	১১৯
পদার্থের ক্ষয়	১২১

রসায়ন

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৪: রসায়নের ধারণা	**১২৩-১২৭**
রসায়নের শাখা	১২৩
রসায়নের কয়েকজন স্মরণীয় পথিকৃৎ	১২৪
রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আবিষ্কার	১২৬
অধ্যায়-১৫: পদার্থ : শ্রেণিবিন্যাস, অবস্থা ও পরিবর্তন	**১২৮-১৩৬**
পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস	১২৮
মিশ্রণ ও দ্রবণ	১৩০
কণার গতিতত্ত্ব	১৩১
ব্যাপন ও নিঃসরণ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন	১৩২
ভৌত পরিবর্তন	
রাসায়নিক পরিবর্তন	
গলন ও স্ফুটন	
বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন	১৩৩
পাতন ও ঊর্দ্ধপাতন	
উপাদান পৃথকীকরণ পদ্ধতি	
বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ	১৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৬: পদার্থের গঠন	**১৩৭-১৪৮**
পরমাণু ও অণু	১৩৭
মৌলের প্রতীক	
সংকেত	১৩৮
পরমাণুর মৌলিক কণিকা	১৩৯
পরমাণুর মডেল	১৪০
থমসনের পরমাণু মডেল	
রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল	
বোরের পরমাণু মডেল	১৪১
কোয়ান্টাম পরমাণু মডেল	
ইলেকট্রন বিন্যাস	১৪২
পারমাণবিক সংখ্যা ও পারমাণবিক ভর সংখ্যা	১৪৩
পারমাণবিক ভর বা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর	১৪৪
আপেক্ষিক আণবিক ভর	
অ্যাভোগ্রেডোর সূত্র ও মোলের ধারণা	১৪৫
আইসোটোপ, আইসোটোন, আইসোবার ও আইসোমার	
তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ	
অধ্যায়-১৭: পর্যায় সারণি	**১৪৯-১৫৭**
পর্যায় সারণির বিকাশ	১৪৯
পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য	১৫০
পর্যায় সারণির বিশেষ গ্রুপভিত্তিক মৌলসমূহ	১৫২
মৌলের ইলেকট্রনিক বিন্যাস থেকে পর্যায় ও গ্রুপ	১৫৩
মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম	
অধ্যায়-১৮: রাসায়নিক বন্ধন	**১৫৮-১৬৭**
রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ	১৫৮
অষ্টক ও দুইয়ের নিয়ম	
যোজনী বা যোজ্যতা	
ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন	১৫৯
যৌগমূলক	১৬০
রাসায়নিক বন্ধনের প্রকারভেদ	
আয়নিক বন্ধন বা তড়িৎযোজী বন্ধন	
সমযোজী বন্ধন	১৬১
ধাতব বন্ধন	১৬২
পোলারিটি	১৬৩
হাইড্রোজেন বন্ধন	১৬৪
সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন	
পানিতে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় যৌগ	১৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১৯: অজৈব যৌগ: ধাতব ও অধাতব পদার্থ	**১৬৮-১৮৬**
ধাতব পদার্থ	১৬৮
বিভিন্ন শ্রেণির ধাতব পদার্থ	
কয়েকটি ধাতব পদার্থের বৈশিষ্ট্য	১৭০
ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ	১৭১
কিছু উল্লেখযোগ্য ধাতু এবং তাদের যৌগসমূহ	
সংকর ধাতু	১৭৪
ধাতু নিষ্কাশন	১৭৬
ধাতুর ক্ষয়	
অধাতব পদার্থ	১৭৭
অধাতব গ্যাস	
খনিজ অধাতু	১৭৮
হ্যালোজেন	১৭৯
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	১৮০
বিষাক্ত অধাতু	১৮১
ধাতু ও অধাতুর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য	
উপধাতু/অপধাতু	১৮২
অধ্যায়-২০: রাসায়নিক বিক্রিয়া	**১৮৭-১৯৪**
রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ	১৮৭
জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া	১৮৮
জারণ সংখ্যা	১৮৯
কয়েক ধরনের জারণ-বিজারণ (রেডক্স) বিক্রিয়া	১৯০
নন-রেডক্স বিক্রিয়া	
বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া	১৯১
বিক্রিয়ার হার	
প্রভাবক	১৯২
লা-শাতেলিয়ার নীতি	
দৈনন্দিন জীবনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ	
অধ্যায়-২১: অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ	**১৯৫-২১০**
অম্ল বা অ্যাসিড	১৯৫
অ্যাসিডের প্রকারভেদ	
অ্যাসিডের ধর্ম	১৯৬
ক্ষারক ও ক্ষার	১৯৭
ক্ষারের প্রকারভেদ	১৯৮
ক্ষারের ধর্ম	
অনুবন্ধী অ্যাসিড ও অনুবন্ধী ক্ষার	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লবণ	১৯৯
লবণের প্রকারভেদ	
লবণের ধর্ম	
অ্যাসিডের ব্যবহার	২০০
খাদ্যে উপস্থিত জৈব অ্যাসিডের নাম	২০১
ক্ষারের ব্যবহার	
লবণের ব্যবহার	২০২
দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয়	২০৩
নির্দেশক	
pH	২০৪
বিভিন্ন পদার্থে pH এর মান	
অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণের প্রভাব	২০৫
পানির খরতা	
অ্যাসিড বৃষ্টি	
অধ্যায়-২২: তড়িৎ রসায়ন	**২১১-২১৯**
তড়িৎ কোষ	২১১
তড়িৎ কোষের প্রকারভেদ	২১২
তড়িৎ রাসায়নিক কোষ	২১৪
প্রাথমিক কোষ	
সেকেন্ডারি কোষ	২১৫
তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ	
তড়িৎ বিশ্লেষণের কয়েকটি ব্যবহার	২১৬
ধাতু নিষ্কাশন	২১৭
ধাতু বিশুদ্ধকরণ	
তড়িৎ প্রলেপন (ইলেকট্রোপ্লেটিং)	
ভোল্টামিটার	২১৮
ফুয়েল সেল	
অধ্যায়-২৩: মাটি, খনিজ ও আকরিক	**২২০-২২৯**
মাটি	২২০
শিলা	২২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
খনিজ	২২২
খনিজ ও শিলার মধ্যে পার্থক্য	
আকরিক	২২৩
জীবাশ্ম জ্বালানি	২২৪
কয়লা	
খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম	২২৫
প্রাকৃতিক গ্যাস	২২৬
অধ্যায়-২৪: জৈব যৌগ	**২৩০-২৪৪**
জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	২৩০
জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ	২৩১
সমগোত্রীয় শ্রেণি	
অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন	২৩২
অ্যালকোহল	২৩৩
অ্যালডিহাইড, কিটোন ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিড	২৩৫
অ্যামিন, অ্যামাইড ও এস্টার	২৩৭
তেল ও চর্বি	২৩৮
সাবান	
ডিটারজেন্ট	
টুথপেস্ট	২৩৯
নিত্য ব্যবহার্য অন্যান্য জৈব যৌগ	
পলিমার	২৪১
অধ্যায়-২৫: কার্বনের বহুমুখী ব্যবহার	**২৪৫-২৫০**
কার্বনের বহুরূপতা	২৪৫
দানাদার কার্বন	
অদানাদার কার্বন	২৪৭
কার্বনের যৌগ	
কার্বন ডাই-অক্সাইড	
কার্বন মনোক্সাইড	২৪৮
কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড	

Part-B: জীববিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
পদার্থের জীববিজ্ঞান-বিষয়ক ধর্ম	**২৫১**
অধ্যায়-২৬: জীববিজ্ঞানের ধারণা	**২৫২-২৬০**
জীববিজ্ঞানের শাখা	২৫২
জীববিজ্ঞানের কয়েকজন স্মরণীয় পথিকৃৎ	২৫৪
জীববৈচিত্র্য ও জীবের শ্রেণিবিন্যাস	২৫৭
দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি	২৫৮
ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতি	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-২৭: কোষতত্ত্ব ও টিস্যুতত্ত্ব	**২৬১-২৭৬**
কোষ	২৬১
কোষের প্রকারভেদ	
জীব কোষের অংশসমূহ	২৬২
মাইটোকন্ড্রিয়া	২৬৩
গলগি বস্তু	২৬৪
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লাইসোজোম	২৬৪
প্লাস্টিড	
কোষগহ্বর	২৬৬
পারঅক্সিসোম	
কোষকঙ্কাল	
রাইবোজোম	
সেন্ট্রোজোম	২৬৭
নিউক্লিয়াস	
উদ্ভিকোষ ও প্রাণিকোষের তুলনামূলক পার্থক্য	২৬৮
কোষ বিভাজন	
কোষচক্র	২৬৯
টিস্যু বা কলা	২৭০
উদ্ভিদ টিস্যু	
প্রাণিটিস্যু	২৭২
অধ্যায়-২৮: জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন	**২৭৭-২৮৭**
বংশগতি ও জিনতত্ত্ব মেন্ডেলতত্ত্ব	২৭৭
বংশগতিবস্তু	২৭৮
ক্রোমোজোম	
নিউক্লিক অ্যাসিড	২৭৯
ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড	২৮০
রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড	
জিন	২৮১
মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ	২৮২
জেনেটিক ডিসঅর্ডার ও সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার	
বিবর্তন	২৮৩
বিবর্তনবাদের ক্রমবিকাশ	
ল্যামার্কের বিবর্তন তত্ত্ব	২৮৪
ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব	
আধুনিক বিবর্তন তত্ত্ব	
জীবাশ্ম ও জীবন্ত জীবাশ্ম	
অধ্যায়-২৯: জীবপ্রযুক্তি	**২৮৮-২৯২**
টিস্যু কালচার ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	২৮৮
রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি	
স্টেম সেল, জিন ক্লোনিং ও জিনোম সিকোয়েন্সিং	২৮৯
জীব প্রযুক্তি ও জৈব নিরাপত্তা	২৯০
ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ডিএনএ ফরেনসিক টেস্ট	২৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-৩০: প্রাণিবৈচিত্র্য	**২৯৩-৩০৩**
প্রাণিবৈচিত্র্যের শ্রেণিবিন্যাস	২৯৩
প্রাণির শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি	
প্রাণিজগৎ	২৯৫
পরিফেরা	
নিডারিয়া	২৯৬
প্লাটিহেলমিনথেস	
নেমাটোডা	
অ্যানেলিডা	২৯৭
আর্থ্রোপোডা	
মলাস্কা	
একাইনোডারমাটা	
কর্ডাটা	২৯৮
মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস	২৯৯
বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী	৩০০
অধ্যায়-৩১: উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**৩০৪-৩১৪**
উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের শ্রেণিবিন্যাস	৩০৪
থিয়োফ্রাস্টাসের কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস	
বেনথাম ও হুকারের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস	৩০৫
অপুষ্পক উদ্ভিদ	৩০৬
সপুষ্পক উদ্ভিদ	৩১০
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৩১১
বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ	
অধ্যায়-৩২: উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	**৩১৫-৩১৯**
মূল	৩১৫
রূপান্তরিত মূল	৩১৬
কাণ্ড	
রূপান্তরিত কাণ্ড	৩১৭
পাতা	
পত্রবিন্যাস	৩১৮
রূপান্তরিত পাতা	
অধ্যায়-৩৩: উদ্ভিদের প্রজনন	**৩২০-৩২৮**
উদ্ভিদের প্রজননের প্রকারভেদ	৩২০
ফুল	৩২১
পরাগায়ন	৩২৩
উদ্ভিদ প্রজননের ধাপসমূহ	
ফল	৩২৪
বীজ	৩২৫
বীজের অঙ্কুরোদগম	৩২৬
ফল ও বীজের বিস্তরণ	
ফটোপিরিয়ডিজম	৩২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-৩৪: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	**৩২৯-৩৪১**
উদ্ভিদের শোষণ সম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহ	৩২৯
ইমবাইবিশন	৩২৯
ব্যাপন	৩৩০
অভিস্রবণ	
উদ্ভিদের পরিবহন ও নির্গমন সম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহ	৩৩০
রস আরোহণ	৩৩০
প্রস্বেদন	
উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান	৩৩১
উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ	৩৩২
সালোকসংশ্লেষণ	৩৩৩
শ্বসন	৩৩৫
উদ্ভিদের চলন	৩৩৬
ফাইটোহরমোন	
অধ্যায়-৩৫: অণুজীববিদ্যা	**৩৪২-৩৬২**
অণুজীব	৩৪২
ভাইরাস	
ভাইরাসের প্রকারভেদ	৩৪৪
উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী কয়েকটি ভাইরাস	৩৪৫
প্রাণিদেহে ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ	
মানুষের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস	৩৫১
ভাইরাসের উপকারিতা	
ব্যাকটেরিয়া	
ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ	৩৫৩
উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া	
প্রাণিদেহে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রামক রোগ	৩৫৪
ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা	৩৫৬
প্রোটোজোয়া এবং প্রোটোজোয়া সৃষ্ট রোগ	৩৫৭
জীবাণুমুক্তকরণ	৩৫৮
অধ্যায়-৩৬: মানবদেহ এবং রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার	**৩৬৩-৪১৮**
মানবদেহ	৩৬৩
কঙ্কালতন্ত্র	
কঙ্কালতন্ত্রের উপাদান	৩৬৪
হাড়/অস্থি	
তরুণাস্থি/কোমলাস্থি	৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অস্থিসন্ধি	৩৬৬
টেনডন ও লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী	
অস্থি সংক্রান্ত রোগ	
পৌষ্টিকতন্ত্র	
পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ	৩৬৭
পৌষ্টিকনালি	
মুখছিদ্র ও মুখবিবর	৩৬৮
গলবিল ও অন্ননালি	
পাকস্থলী	
ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র	৩৬৯
পৌষ্টিক গ্রন্থি	
লালা গ্রন্থি	
যকৃৎ	
অগ্ন্যাশয়	৩৭০
গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিকগ্রন্থি	
পৌষ্টিকতন্ত্র সংক্রান্ত রোগ	
খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া	৩৭১
সংবহনতন্ত্র	৩৭২
রক্ত সংবহনতন্ত্র	
রক্ত	
রক্তের উপাদান	৩৭৩
রক্তরস	
রক্তকণিকা	৩৭৪
রক্তবাহিকা	৩৭৬
হৃৎপিণ্ড	৩৭৭
রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন	৩৭৮
রক্তের গ্রুপ	
রক্তচাপ	৩৭৯
রক্ত সংবহনতন্ত্র সংক্রান্ত রোগ	
লসিকাতন্ত্র	৩৮১
লসিকা বা লিম্ফ	
লসিকা নালি ও লসিকা গ্রন্থি	
শ্বসনতন্ত্র	
শ্বসন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ	
নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ	৩৮২
গলবিল বা গলনালি	
স্বরযন্ত্র	
শ্বাসনালি	
বায়ুনালি ও মধ্যচ্ছদা	
ফুসফুস	
মানবদেহের শ্বাসক্রিয়া	৩৮৩
শ্বাসনালি সংক্রান্ত রোগ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
রেচনতন্ত্র	৩৮৪
বৃক্ক	
নেফ্রন	৩৮৫
মূত্র	
রেচনতন্ত্র সংক্রান্ত রোগ	৩৮৬
সমন্বয়	
স্নায়ুতন্ত্র	
স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	৩৮৭
মস্তিষ্ক	
সুষুম্নাকাণ্ড	৩৮৮
স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ: প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র	
করোটিক স্নায়ু	
সুষুম্না স্নায়ু	৩৮৯
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র	
স্নায়ুকলা	
নিউরন	
নিউরোগ্লিয়া	৩৯০
স্নায়বিক বৈকল্য জনিত শারীরিক সমস্যা	
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	৩৯১
হরমোন	
প্রাণরস বা হরমোনজনিত অস্বাভাবিকতা	৩৯৩
প্রজননতন্ত্র	
মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা	৩৯৪
গর্ভাবস্থা ও গর্ভবতীর পরিচর্যা	
নবজাতক	৩৯৫
শিশুর পরিচর্যা	
মানব সংবেদী অঙ্গ	
চোখ	৩৯৬
কান	৩৯৭
মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ সংক্রান্ত বিদ্যা	৩৯৮
রোগ/ব্যাধি/অসুস্থতা	
রোগ জীবাণুর জীবনধারণ	
বিভিন্ন রোগ নির্ণায়ক যন্ত্র	৩৯৯
বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি	৪০১
প্রাথমিক চিকিৎসা	৪০২
ইমুনাইজেশন ও ভ্যাকসিনেশন	
ইমিউন তন্ত্র	৪০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি	৪০৪
ভ্যাকসিন বা টিকা	৪০৫
ভ্যাকসিনেশন	৪০৬
সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বা EPI	
অধ্যায়-৩৭: খাদ্য, পুষ্টি ও ভিটামিন	**৪১৯-৪৩৭**
খাদ্য	৪১৯
আমিষ	
অ্যামিনো অ্যাসিড	৪২০
আমিষের উৎস	
শর্করা বা শ্বেতসার	৪২১
শর্করার উৎস	৪২২
শর্করার প্রকারভেদ	
স্নেহ	৪২৩
স্নেহ পদার্থের উৎস	
রাফেজ বা আঁশ	৪২৪
খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন	
ভিটামিনের প্রকারভেদ	
তেল বা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	৪২৫
পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	
খনিজ লবণ	৪২৬
পানি	৪২৮
পুষ্টি	
সুষম খাদ্য	
খাদ্য সংরক্ষণ	৪২৯
আদর্শ খাদ্য পিরামিড	৪৩০
বিএমআই ও বিএমআর	
অধ্যায়-৩৮: পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র	**৪৩৮-৪৪৬**
পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান	৪৩৮
প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীব সম্প্রদায়	৪৩৮
বাস্তুতন্ত্র	৪৩৯
বাস্তুতন্ত্রের উপাদান	
বায়োম	৪৪১
বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি ও শক্তি প্রবাহ	৪৪২
খাদ্য শৃঙ্খল	৪৪৩
খাদ্য জাল	
ইকোলজিক্যাল পিরামিড	৪৪৪
জীবের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া	৪৪৫

Part-C: আধুনিক বিজ্ঞান

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-৩৯: মহাবিশ্ব ও পৃথিবী	**৪৪৭-৪৬৮**
জ্যোতির্বিদ্যা	৪৪৭
জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকজন স্মরণীয় পথিকৃৎ	৪৪৮
জ্যোতিষ্ক	৪৪৯
নক্ষত্র বা তারা	
নীহারিকা	৪৫০
গ্রহ	
উপগ্রহ	৪৫১
সৌরজগৎ	
সূর্য	৪৫২
সৌর জগতের আটটি গ্রহ	
বামন গ্রহ	৪৫৪
ছায়াপথ	৪৫৫
ধূমকেতু	৪৫৬
উল্কা	
মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি এবং পরিণতি	
বিগ ব্যাং থিওরি	
মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বয়স	
পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন	৪৫৭
মহাবিশ্বের পরিণতি সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ	
আপেক্ষিক তত্ত্ব	৪৫৮
বোস আইনস্টাইন তত্ত্ব	
মহাজাগতিক কণা: ফার্মিওন ও বোসন	৪৫৯
মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে	
মহাকাশ অনুসন্ধান ও অভিযানসমূহ	
মহাকাশ গবেষণা	
মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহ	৪৬০
চন্দ্র অভিযান	৪৬১
মঙ্গল অভিযান	
পৃথিবীর গতি	৪৬২
পৃথিবীর কাল্পনিক রেখাসমূহ	৪৬৪
অধ্যায়-৪০: পৃথিবীর পরিমণ্ডল	**৪৬৯-৪৯৪**
স্থলমণ্ডল বা ভূমণ্ডল	৪৬৯
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন	
ভূ-অভ্যন্তরের স্তরসমূহ	৪৭০
টেকটোনিক প্লেট	৪৭২
পৃথিবীর মৌলিক উপাদান, খনিজ ও শিলা	
জীবমণ্ডল	৪৭৩
বায়ুমণ্ডল	৪৭৪
বায়ুর উপাদান	
বায়ুমণ্ডলের স্তর	
নাইট্রোজেন চক্র	৪৭৬
কার্বন চক্র ও অক্সিজেন চক্র	৪৭৭
আবহাওয়া ও জলবায়ু	
জলবায়ুর উপাদান	
বারিমণ্ডল	৪৮২
মহাসাগর ও অন্যান্য জলরাশি	
সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ	৪৮৩
সামুদ্রিক জীবন	৪৮৪
সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম	
মহাসাগরীয় স্রোত বা সমুদ্রস্রোত	৪৮৫
জলবায়ু পরিবর্তন	
জোয়ার-ভাটা	৪৮৬
পানিচক্র	৪৮৭
বৃষ্টিপাত	৪৮৮
অধ্যায়-৪১: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ	**৪৯৫-৫১৫**
জলবায়ু পরিবর্তন	৪৯৫
গ্রিন হাউজ ইফেক্ট	
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	৪৯৬
ওজোন স্তরের ক্ষয়	৪৯৭
পরিবেশ দূষণ	
দুর্যোগ	৫০২
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৫০৩
ঘূর্ণিঝড়	
জলোচ্ছ্বাস	৫০৪
সুনামি	
ঝড়	
বজ্রপাত	৫০৫
ভূমিকম্প	
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত	৫০৮
দাবানল	
বন্যা	
নদীভাঙন	৫০৯
খরা	৫১০
লবণাক্ততা	
মানবসৃষ্ট দুর্যোগ	
অধ্যায়-৪২: কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন কালচার	**৫১৬-৫২১**
বিভিন্ন কালচার বা চাষবিদ্যা	৫১৬
কয়েকটি কালচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৫১৭
মডেল টেস্ট	**৫২২-৫২৮**

বিজ্ঞানীর নাম	উল্লেখযোগ্য অবদান
সি. ভি. রমন (১৮৮৮-১৯৭০)	• ভারতীয় পদার্থবিদ। • ১৯২৮ সালে মত দেন-পদার্থের ওপর আলো পড়লে তা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলায়; একে 'রমন প্রভাব' বলা হয় যা স্পেকট্রোস্কপিতে বিপ্লব সাধন করে। • আলোর বিচ্ছুরণ গবেষণার জন্য ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি উপমহাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী।
সত্যেন্দ্র নাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)	• ভারতীয় তাত্ত্বিক পদার্থবিদ; একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। • ১৯২৪ সালে ফোটন কণাগুলোকে অসনাক্তনীয় (indistinguishable) ধরে 'প্ল্যাঙ্ক বিকিরণ সূত্র' নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন; এখান থেকেই বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের সূত্রপাত। • পূর্ণসংখ্যা-স্পিন কণিকা যেগুলো এই পরিসংখ্যান মানে, সেগুলোকে তাঁর সম্মানে 'বোসন' বলা হয়।
ভার্নার হাইজেনবার্গ (১৯০১-১৯৭৬)	• জার্মান পদার্থবিদ। • ১৯২৫ সালে ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স প্রদান করেন যা প্রথম দিকের পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বগুলোর একটি। • ১৯২৭ সালে প্রদত্ত 'অনিশ্চয়তা নীতি'-এর জন্য ১৯৩২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
এনরিকো ফার্মি (১৯০১-১৯৫৪)	• ইতালীয় পদার্থবিদ। • ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান (ফার্মিয়ন আচরণ) ও বিটা ক্ষয় তত্ত্বে অগ্রণী অবদান রাখেন। • নিউট্রন বোম্বার্ডমেন্টে সৃষ্ট কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা গবেষণার জন্য ১৯৩৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান। • ১৯৪২ সালে শিকাগো পাইল-১-এ প্রথম নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক চেইন বিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।
এস. চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫)	• ভারতীয় তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। • শ্বেত বামনের সর্বোচ্চ স্থিতিশীল ভর গণনা করে চন্দ্রশেখর সীমা (১.৪ সূর্যভর) নির্ধারণ করেন। • ১৯৮৩ সালে নক্ষত্রের গঠন ও বিবর্তন নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য উইলিয়াম এ. ফাউলারের সঙ্গে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল লাভ করেন।
আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬)	• পাকিস্তানি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। • ১৯৭৯ সালে 'Electroweak Force' তত্ত্ব প্রদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮)	• বৃটিশ তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী, মহাকাশতত্ত্ববিদ ও লেখক। • কোয়ান্টাম প্রভাবের কারণে ব্ল্যাক হোল থেকেও কণা/বিকিরণ নির্গমন ঘটতে পারে–এই পূর্বাভাস 'হকিং বিকিরণ' নামে পরিচিত। • 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (A Brief History of Time) তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত বই।

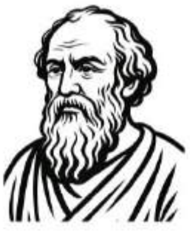	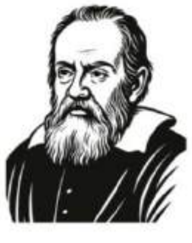			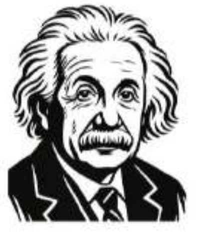
আর্কিমিডিস	**গ্যালিলিও গ্যালিলি**	**আইজ্যাক নিউটন**	**মাদাম মেরী কুরী**	**আলবার্ট আইনস্টাইন**

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী John Clarke (জন ক্লার্ক), ফরাসি বিজ্ঞানী Michel Devoret (মিশেল দেভরেট) ও আমেরিকান বিজ্ঞানী John M. Martinis (জন এম মার্টিনিস) সম্মিলিতভাবে ২০২৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তারা 'Macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit' আবিষ্কারের জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছেন যা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও সেন্সর প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পারমাণবিক চেইন বিক্রিয়া (Nuclear Chain Raction)

✪ **পারমাণবিক চেইন বিক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ–**

১. ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর নিউক্লিয়াসে একটি নিউট্রন আঘাত করে।
২. নিউক্লিয়াসটি ভেঙে দুইটি হালকা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় (বেরিয়াম ও ক্রিপটন)। এই বিক্রিয়ায় বিপুল তাপশক্তি (প্রায় ২০০ MeV) উৎপন্ন হয়।
৩. এতে তিনটি নতুন নিউট্রন মুক্ত হয়।
৪. এই তিনটি নিউট্রন আবার তিনটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসে আঘাত করে।
৫. ফলাফলস্বরূপ আবার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং ৯টি নিউট্রন সৃষ্টি হয়।
৬. প্রতিটি ধাপে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বিক্রিয়া চলমান থাকে। এই বিক্রিয়াকে চেইন বিক্রিয়া (Chain Reaction) বলে।

নিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অপর পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত চেইন বিক্রিয়া পারমাণবিক বোমায় ব্যবহৃত হয়।

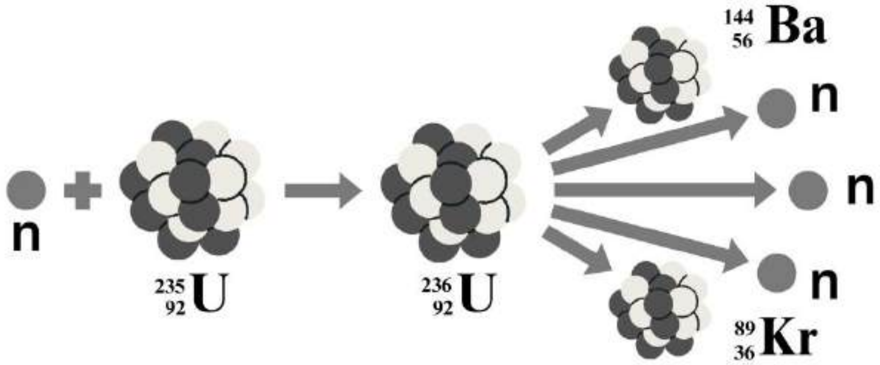

✪ **ইউরেনিয়াম (Uranium):** তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার মূল জ্বালানী। এটি পর্যায় সারণির ৯২তম মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৯২ এবং পারমাণবিক ভর ২৩৮। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপসমূহের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ–

আইসোটোপ	প্রাপ্যতা	বৈশিষ্ট্য
ইউরেনিয়াম-২৩৮	৯৯.৩%।	তুলনামূলক স্থিতিশীল।
ইউরেনিয়াম-২৩৫	০.৭%।	ফিশন বিক্রিয়ার জন্য প্রধানত ব্যবহৃত হয়।
ইউরেনিয়াম-২৩৪	খুবই স্বল্প পরিমাণ।	কম ব্যবহৃত হয়।
ইউরেনিয়াম-২৩৩	প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না।	সবচেয়ে অস্থিতিশীল।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের আধার হিসাবে পারমাণবিক চুল্লির প্রয়োজন হয়। এই চুল্লি মূলত এক প্রকার তাপীয় যন্ত্র– পারমাণবিক জ্বালানী এই চুল্লিতে চেইন বিক্রিয়া সংঘটিত করে বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। 'এনারিকো ফার্মি' পারমাণবিক চুল্লি আবিষ্কার করেন।

১৯৪২ সালে প্রথম পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করা হয়। তবে ১৯৫৪ সালে রাশিয়া সর্বপ্রথম মানবকল্যাণ– বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার শুরু করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক চুল্লি আছে।

বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৪০০ মেগাওয়াট। এই প্রকল্পে রাশিয়া প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

✪ **পারমাণবিক চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধাপসমূহ:** পারমাণবিক চুল্লিতে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এতে নিম্নে বর্ণিত ধাপগুলো ক্রমাগত চলতে থাকে–

১. **তাপ উৎপাদন:** ইউরেনিয়াম-২৩৫ জ্বালানি চেইন বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন করে।
২. **বাষ্প উৎপাদন:** উৎপন্ন তাপ চুল্লির পাশে থাকা পাইপে প্রবাহিত পানিকে গরম করে বাষ্পে পরিণত করে।
৩. **টারবাইন সচল করা:** উচ্চ চাপের বাষ্প টারবাইনে প্রবাহিত হয়ে তা ঘুরাতে থাকে।
৪. **জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন:** টারবাইনের সাথে যুক্ত জেনারেটর ঘুরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।
৫. **পুনরাবৃত্তি:** উত্তপ্ত বাষ্প কুলিং টাওয়ারে ঠান্ডা হয়ে আবার পানিতে পরিণত হয় এবং পুনরায় ধাপ ১ শুরু হয়।

আর্কিমিডিসের নীতি

২৮৭ খ্রিষ্টপূর্বে আর্কিমিডিস বৃহত্তর গ্রিসের সিসিলি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত প্লবতার সূত্রটি হলো–
"কোনো বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত করলে বস্তুটি কিছু ওজন হারায় বলে মনে হয়। বস্তুর এই হারানো ওজন, বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।"

আর্কিমিডিসের নীতি অনুসারে–

ওজনের শর্ত	ঘনত্বের শর্ত	ফলাফল
বস্তুর ওজন > বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন	বস্তুর ঘনত্ব > তরলের ঘনত্ব	বস্তুটি ডুবে যাবে।
বস্তুর ওজন = বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন	বস্তুর ঘনত্ব = তরলের ঘনত্ব	বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে।
বস্তুর ওজন = বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন	বস্তুর ঘনত্ব < তরলের ঘনত্ব	বস্তুটি আংশিক ডুবে থাকবে।
বস্তুর ওজন < বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন	বস্তুর ঘনত্ব < তরলের ঘনত্ব	বস্তুটি ভাসবে।

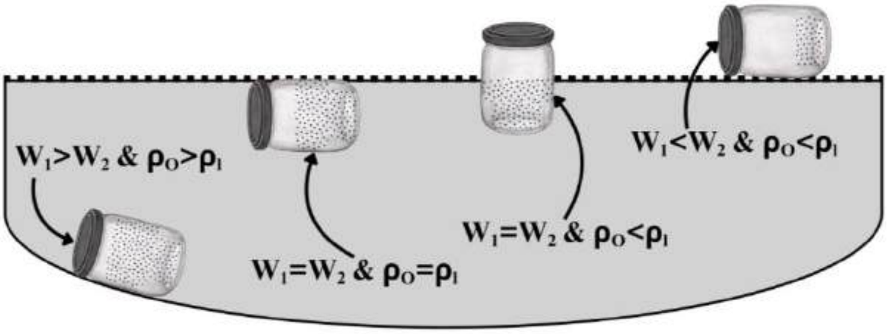

চিত্রে W_1 = বস্তুর ওজন, W_2 = বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন, ρ_o = বস্তুর ঘনত্ব, ρ_l = তরলের ঘনত্ব।

✪ **আর্কিমিডিসের নীতির বাস্তব উদাহরণ:** লোহা পানিতে ভাসে না কিন্তু লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে। কারণ লোহার টুকরা দ্বারা অপসারিত পানির ওজন লোহার টুকরার ওজনের চেয়ে অনেক কম। জাহাজ লোহার তৈরি হলেও এর ভেতরটা ফাঁপা। তাই লোহার তৈরি জাহাজ দ্বারা অপসারিত পানির ওজন, জাহাজের ওজনের তুলনায় বেশি। ফলে লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে।

প্লিমসল লাইন: অতিরিক্ত মাল বোঝাই এড়ানোর জন্য জাহাজের গায়ে তার নিমজ্জন সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। একে প্লিমসল লাইন বলে। এর অপর নাম ওয়াটার লাইন।

✪ **স্থির তরলের অভ্যন্তরে চাপ ও প্লবতা:** তরলের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে চাপের মান সেই বিন্দুর গভীরতার উপর নির্ভর করে, ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না। তরলে কোনো বিন্দুর গভীরতা h, তরলের ঘনত্ব ρ, অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে সে বিন্দুতে চাপ $P = h\rho g$।

পৃষ্ঠটান (Surface Tension)

সকল তরলেরই একটি বিশেষ ধর্ম আছে; সেটি হলো- তরল পৃষ্ঠ সর্বদা সংকুচিত হতে চায় যাতে তার ক্ষেত্রফল যতটা সম্ভব কম হয়। তরল পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সংকোচনের এই প্রবণতাকে তরলের পৃষ্ঠটান বলা হয়। যদি তরলের মুক্তপৃষ্ঠে একটি রেখা কল্পনা করা হয়, তবে ঐ রেখার প্রতি একক দৈর্ঘ্যে রেখার সাথে লম্বভাবে পৃষ্ঠতল বরাবর এবং রেখার উভয়পাশে যে বল ক্রিয়া করে তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান বলে। পৃষ্ঠটানের SI একক নিউটন/মিটার (Nm^{-1}) ও CGS একক ডাইন/সেমি। বিশুদ্ধ পানির পৃষ্ঠটান প্রায় ০.০৭২ Nm^{-1}।

✪ **তরলের পৃষ্ঠটানের উপর বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব:**

- তরলের তাপমাত্রা বাড়লে পৃষ্ঠটান কমে।
- তরল পৃষ্ঠ কোনো অপদ্রব্য দ্বারা দূষিত হলে সাধারণভাবে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান কমে যায়।
- তরলে অজৈব বস্তু দ্রবীভূত থাকলে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান বেড়ে যায়। আবার জৈব বস্তু দ্রবীভূত থাকলে পৃষ্ঠটান কমে যায়
- তরল পৃষ্ঠে তড়িৎ আধান থাকলে তরলের পৃষ্ঠটান কমে যায়।

8. **কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory):** আলোক শক্তি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে বের না হয়ে অসংখ্য শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এই শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেটের একটি সর্বনিম্ন মান আছে। এই সর্বনিম্ন মানের শক্তি সম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে। ফোটন চার্জ নিরপেক্ষ ও ভরহীন হয়ে থাকে।

$$\text{ফোটনের শক্তি } E = h \times f = h \times \frac{c}{\lambda} \quad [\text{যেহেতু } c = f \times \lambda]$$

যেখানে h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক $= 6.63 \times 10^{-34}$ Js, f = আলোর কম্পাংক, c = আলোর বেগ, λ = ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।
কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, ফটো-তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা গেলেও বিচ্ছুরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না।

তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালি

কোনো পদার্থের পরমাণুতে শক্তি প্রদান করলে পরমাণুর ইলেকট্রন সেই শক্তি শোষণ করে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে স্থিতিশীলতা প্রাপ্তি ও পুনরায় পূর্বের শক্তি স্তরে ফিরে আসার জন্য ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করে। এই বিকিরিত শক্তিকে আমরা আলো হিসেবে দেখতে পাই যা মূলত তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নিয়ে তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ গঠিত, যেগুলোর মাঝে শুধু আলো দৃশ্যমান।

- **তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রম–**
  গামা রশ্মি < রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে) < অতিবেগুনী রশ্মি < দৃশ্যমান আলো < অবলোহিত রশ্মি < মাইক্রোওয়েভ < বেতার তরঙ্গ।

- **নিম্নের চিত্রে তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালি ও তার বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো–**

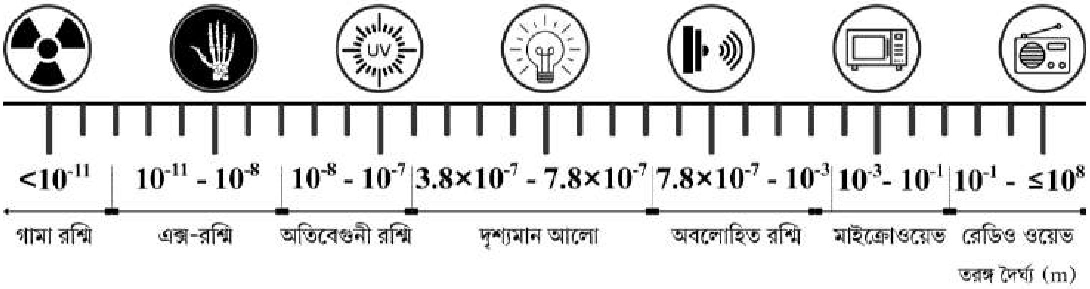

✪ **তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গগুলোর ব্যবহার:**

তরঙ্গের নাম	ব্যবহার
বেতার তরঙ্গ	মোবাইল ফোন, জিপিএস, বিমান চালনা, রেডিও ও টিভি সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	রাডার যন্ত্র, নৌ ও বিমান চালনা, রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প কারখানা, মাইক্রোওভেন ইত্যাদিতে এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।
অবলোহিত রশ্মি	এই বিকিরণ সৌরচুল্লি, সৌর হিটার, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কুয়াশা বা অন্ধকারের মধ্যে ছবি উত্তোলন, ফল শুষ্ককরণ, মাংসপেশির ব্যথা বা টানের চিকিৎসা ইত্যাদিতে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
দৃশ্যমান আলো	এই তরঙ্গ আমাদের দেখার অনুভূতি জন্মায়। এই তরঙ্গের সীমা লাল বর্ণ থেকে বেগুনি বর্ণ।
অতিবেগুনি রশ্মি	চুরি নিরোধক অ্যালার্ম, স্বয়ংক্রিয় দরজা খোলার যন্ত্র ও কাউন্টার, আসল হীরা ও নকল ব্যাংক নোট শনাক্তকরণ, শল্যচিকিৎসায় যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণ, রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটন, ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া সংঘটন, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, মানব শরীরে ভিটামিন D তৈরি ইত্যাদিতে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে)	ভাঙা হাড় ও দেহের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি উত্তোলন, দেহের ক্ষতিকারক টিউমার সেল ধ্বংসকরণ, ধাতব যন্ত্রের ফাটল শনাক্তকরণ ইত্যাদিতে এক্স-রে ব্যবহৃত হয়।
গামা রশ্মি	চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়, বিজ্ঞানাগারে গবেষণা, ধাতব পদার্থের খুঁত নির্ণয়, মানব দেহে ক্যান্সার আক্রান্ত সেল ধ্বংসকরণ ইত্যাদিতে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

ড. মোহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা (১৮৯৪-১৯৭৭)

বাংলাদেশের অগ্রণী জৈব-রসায়নবিদ ও বিজ্ঞান সংগঠক। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বিজ্ঞান চর্চার ভিত গড়ে তোলেন। প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর গবেষণায় তিনি গাছপালা, খনিজ ও কৃষিজ বর্জ্য থেকে গ্লুকোজ পাউডার, প্রাণিজ উৎসেচক 'গ্লুকোজাইম', জুটভিত্তিক কাগজ রংসহ প্রায় ১৮টি উদ্ভাবন শিল্প কারখানায় প্রয়োগযোগ্য করে তোলেন। তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে বিজ্ঞান গবেষণাগার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন; যার ওপর ভর করে পরবর্তীতে ওষুধ, সার ও খাদ্য রসায়নের দেশীয় উৎপাদন বিস্তীর্ণ হয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তক হিসাবে তিনি স্মরণীয়। বিশেষ স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পাকিস্তান সরকারের 'তঘমা-ই-ইমতিয়াজ' ও 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' এবং বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (১৯৭৬) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৪) অর্জন করেন।

২০২৫ সালে জাপানি বিজ্ঞানী Susumu Kitagawa (সুসুমু কিতাগাওয়া), ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Richard Robson (রিচার্ড রবসন) ও ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিজ্ঞানী Omar M. Yaghi (ওমর এম. ইয়াগি) সম্মিলিতভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। ধাতব-জৈব কাঠামো (মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস) আবিষ্কারের জন্য তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত অণুজাতীয় কাঠামটিতে বড় শূন্যস্থান রয়েছে। এই কাঠামোর মাধ্যমে মরুভূমির বাতাস থেকে পানি সংগ্রহ, কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ, বিষাক্ত গ্যাস সংরক্ষণ বা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করা যায়।

রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আবিষ্কার

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	আবিষ্কারকের জন্মস্থান	অবিষ্কারের সাল
সালফিউরিক অ্যাসিড	জাবির ইবনে হাইয়ান	পারস্য (ইরান)	৮০০
কার্বন ডাই অক্সাইড	ভ্যান হেলমন্ট	বেলজিয়াম	১৬৩০
ফসফরাস	হেননিগ ব্রান্ড	জার্মানি	১৬৬৯
হাইড্রোজেন	হেনরি ক্যাভেন্ডিস	যুক্তরাজ্য	১৭৬৬
নাইট্রিক অক্সাইড	জোসেফ প্রিস্টলি	যুক্তরাজ্য	১৭৭২
ক্লোরিন	উইলহেম শীলে	জার্মানি	১৭৭৪
অক্সিজেন	জোসেফ প্রিস্টলি	যুক্তরাজ্য	১৭৭৪
হাইড্রোজেন সালফাইড	উইলহেম শীলে	জার্মানি	১৭৭৭
সিলিকন	জ্যাকব বার্জেলিয়াস	সুইডেন	১৮২৪
ওজোন	ফ্রেডরিক শোনবাইন	জার্মানি	১৮৪০
ইলেকট্রন	জে. জে. থমসন	যুক্তরাজ্য	১৮৯৭
রেডিয়াম	মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরি	ফ্রান্স	১৮৯৮
প্লাস্টিক (বাকেলাইট)	লিও বেকল্যান্ড	বেলজিয়াম (আবিষ্কারের স্থান- যুক্তরাষ্ট্র)	১৯০৭
পারমাণবিক সংখ্যা	হেনরি মোসলে	যুক্তরাজ্য	১৯১৩
প্রোটন	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড	যুক্তরাজ্য	১৯১৯
নিউট্রন	জেমস চ্যাডউইক	যুক্তরাজ্য	১৯৩২

রসায়ন পাঠ করে আমরা জানতে পারি পদার্থ কীভাবে গঠিত, তাদের অণু ও পরমাণুর বিন্যাস কেমন এবং তারা কিভাবে একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, নতুন যৌগ তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করি। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তি, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের বিস্তৃতি ব্যাপক। তাই বলা যায়– রসায়ন শুধু পাঠ্য নয় বরং আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ।

বিরল মৃত্তিকা ধাতু (Rare Earth Metals-REMs)

১৭টি মৌলের একটি গ্রুপ হলো বিরল খনিজ। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির (IUPAC) নামকরণ অনুযায়ী, পর্যায় সারণির ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌলের সঙ্গে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়ামকে একত্রে বিরল খনিজ বলে। এগুলো মাটিতে পাওয়া যায় এবং এদের প্রক্রিয়াকরণ জটিল হওয়ায় এদের বিরল মৃত্তিকা ধাতু (Rare Earth Elements-REEs) বলা হয়। ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌল হলোঃ ল্যান্থানাম (La), সেরিয়াম (Ce), প্রাসিওডিমিয়াম (Pr), নিওডিমিয়াম (Nd), প্রোমেথিয়াম (Pm), সামারিয়াম (Sm), ইউরোপিয়াম (Eu), গ্যাডোলিনিয়াম (Gd), টার্বিয়াম (Tb), ডিসপ্রোসিয়াম (Dy), হোলমিয়াম (Ho), এরবিয়াম (Er), থুলিয়াম (Tm), ইটার্বিয়াম (Yb), লুটেটিয়াম (Lu)। ১৭টি বিরল খনিজের মধ্যে নিওডিমিয়াম, ইউরোপিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম ও ইত্রিয়াম- এই পাঁচটির ব্যবহার তুলনামূলক বেশি। বিরল খনিজের দুটি ভাগ–হালকা ও ভারী।

✪ **বিরল খনিজের ব্যবহার:** বিরল খনিজের বিস্ময়কর আলোক বিকীরণ ও চৌম্বক ধর্মের কারণে এটি আইফোন, চিপ, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম, সামরিক সরঞ্জাম ও আধুনিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে এর ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যাপক,যেমন-

- শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক
- কম্পিউটার, টেলিভিশন বা স্মার্টফোনের রঙিন স্ক্রিন
- স্মার্টফোনের ভাইব্রেশন, হেডফোনের বা ইয়ারবাডসের শব্দ
- হার্ড ডিস্কে তথ্য সংরক্ষণ
- এমআরআই মেশিনের চৌম্বক ক্ষেত্র
- বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত যানবাহনের মোটর
- উড়োজাহাজ, জেনারেটর, স্পিড সেন্সর, রাডার সিস্টেম, কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
- উইন্ডমিল ও সোলার প্যানেল
- কোয়ান্টাম কম্পিউটিং।

✪ **বিরল খনিজের মজুত:** বিরল খনিজ মজুদে ও উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীন। মজুদে এর পরের অবস্থানে আছে ব্রাজিল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ভিয়েতনাম এবং যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপল আইফোন তৈরিতে 'বিরল মৃত্তিকা ধাতু' আমদানি করে চীন থেকে। বাংলাদেশে নদী অববাহিকার বালু, জেগে ওঠা চর, সৈকত বালু এবং কয়লাখনি থেকে বিরল খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন।

Previous Job Questions

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

১. **বিরল ভূতল খনিজ (Rare-Earth Minerals) সম্পর্কিত কোন তথ্যটি সঠিক?** *[৪৭তম বিসিএস]*
ⓚ এর মধ্যে ১৫টি ধাতু রয়েছে
ⓚ লিথিয়াম এই খনিজের মধ্যে অন্যতম সদস্য
ⓖ এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে
ⓖ ইউক্রেন এ খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে আছে **উ.** গ

২. **আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত?** *[৪৫তম বিসিএস; ২৪তম বিসিএস]*
ⓚ ৩৩ ⓚ ৩৮ ⓖ ৩৬ ⓖ ৪৪ **উ.** ক

৩. **কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নয়?** *[২০তম বিসিএস]*
ⓚ লৌহ ⓚ ইউরেনিয়াম
ⓖ প্লুটোনিয়াম ⓖ নেপচুনিয়াম **উ.** ক

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষা

১. **কোন মৌলটির আয়নীকরণ শক্তি বেশি?** *[নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ : ২৩]*
ⓚ Li ⓚ B ⓖ C ⓖ Ne **উ.** ঘ

২. **আধুনিক পর্যায় সারণির মূলভিত্তি কী?** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (রসায়ন) : ২১]*
ⓚ পারমাণবিক সংখ্যা
ⓚ পারমাণবিক ভর
ⓖ ইলেকট্রন বিন্যাস
ⓖ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর **উ.** গ

৩. **কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কতটি?** *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক : ২১; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা অধিদপ্তরের কারা তত্ত্বাবধায়ক : ১৩]*
ⓚ ৫টি ⓚ ১১টি ⓖ ৬টি ⓖ ২০টি **উ.** ঘ

৪. **নিচের কোন মৌলটির d অরবিটালে 10টি ইলেকট্রন রয়েছে?** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (রসায়ন) : ২১]*
ⓚ Zn ⓚ Ni ⓖ Mg ⓖ Se **উ.** ক

৫. **কোনটির ইলেকট্রন আসক্তি সর্বাধিক?** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (রসায়ন) : ২১]*
ⓚ F ⓚ Cl ⓖ Br ⓖ I **উ.** খ

৬. **অবস্থান্তর মৌল কোনটি?** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (রসায়ন) : ২১]*
ⓚ Sc ⓚ Zn ⓖ Cu ⓖ Rb **উ.** গ

ক্ষার ধাতুসমূহ মনে রাখার কৌশল (Mnemonic)					
লিনা কে রুবি সাজাবে ফ্রান্সে					
লি	না	কে	রুবি	সাজাবে	ফ্রান্সে
Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
লিথিয়াম	সোডিয়াম	পটাশিয়াম	রুবিডিয়াম	সিজিয়াম	ফ্রান্সিয়াম

✪ **মৃৎক্ষার ধাতু (Alkaline Earth Metals):** পর্যায় সারণিতে গ্রুপ-২ এ অবস্থিত মৌলগুলোকে 'মৃৎক্ষার ধাতু' বলে। যথা– বেরিলিয়াম (Be), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), ক্যালসিয়াম (Ca), স্ট্রোনসিয়াম (Sr), বেরিয়াম (Ba), রেডিয়াম (Ra)। এই সকল ধাতু বিভিন্ন অক্সাইড হিসেবে মাটিতে উপস্থিত থাকে এবং পানির সাথে বিক্রিয়ায় ক্ষার ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এ কারণে এরা মৃৎক্ষার ধাতু নামে পরিচিত। অর্থাৎ, মৃৎক্ষার ধাতু + পানি = শক্তিশালী ক্ষার + হাইড্রোজেন গ্যাস।

উদাহরণ– Mg (ম্যাগনেসিয়াম) + $2H_2O$ (পানি) = $Mg(OH)_2$ (ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড) + H_2 (হাইড্রোজেন গ্যাস)।

মৃৎক্ষার ধাতুসমূহ দ্বিযোজী মৌল এবং এদের সর্বশেষ কক্ষপথে দুটি করে ইলেকট্রন থাকে। এ ইলেকট্রন দুটি ত্যাগ করে ক্যাটায়ন তৈরির মাধ্যমে এরা আয়নিক যৌগ গঠন করে।

মৃৎক্ষার ধাতুসমূহ মনে রাখার কৌশল (Mnemonic)					
বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখ					
বিরিয়ানি	মোসলাই	কাবাব	সরিয়ে	বাটিতে	রাখ
Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Ra
বেরিলিয়াম	ম্যাগনেসিয়াম	ক্যালসিয়াম	স্ট্রোনসিয়াম	বেরিয়াম	রেডিয়াম

✪ **অভিজাত ধাতু (Nobel Metals):** যে সকল ধাতু সহজে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না তাদের 'অভিজাত ধাতু' বলে। এরা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই ধাতুসমূহ– স্বর্ণ (Au), রৌপ্য (Ag), প্লাটিনাম (Pt), রোডিয়াম (Rh), প্যালাডিয়াম (Pd), ইরিডিয়াম (Ir), ওস্মিয়াম (Os), রুথেনিয়াম (Ru), রেনিয়াম (Re) [আংশিকভাবে ধরা হয়]।

অভিজাত ধাতুসমূহ মনে রাখার কৌশল (Mnemonic)								
স্বর্ণার রূপার প্লেট রেডি; পোলাও, ইলিশ ও রুই রানবে (রান্না করবে)								
স্বর্ণার	রূপার	প্লেট	রেডি	পোলাও	ইলিশ	ও	রুই	রানবে
Au	Ag	Pt	Rh	Pd	Ir	Os	Ru	Re
স্বর্ণ	রৌপ্য	প্লাটিনাম	রোডিয়াম	প্যালাডিয়াম	ইরিডিয়াম	ওস্মিয়াম	রুথেনিয়াম	রেনিয়াম

✪ **মুদ্রা ধাতু (Coinage Metals):** পর্যায় সারণির গ্রুপ-১১ এ অবস্থিত তিনটি মৌলকে 'মুদ্রা ধাতু' বলে। যথা– কপার বা তামা (Cu), রৌপ্য (Ag) ও স্বর্ণ (Au)। প্রাচীনকালে এ ধাতুসমূহ ব্যবহার করে মুদ্রা তৈরি করা হতো যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হতো।

মুদ্রা ধাতুসমূহ মনে রাখার কৌশল (Mnemonic)		
তামিম রূপগঞ্জের স্বর্ণকার		
তামিম	রূপগঞ্জের	স্বর্ণকার
Cu	Ag	Au
কপার বা তামা	রৌপ্য	স্বর্ণ

উল্লেখ্য জিরকন, ম্যাগনেটাইট, ইলমোনাইট, কোরান্ডাম, মোনানজাইট, রুটাইল প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত মূল্যবান খনিজ **'কালো সোনা'** নামে পরিচিত।

✪ **নরম ধাতু (Soft Metals):** যে সকল ধাতু গঠনগত দিক থেকে নরম তাদের নরম ধাতু বলে। সব ক্ষার ধাতু ও মুদ্রা ধাতুই 'Soft Metal'। এছাড়া আরও কিছু ধাতুকেও তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে 'Soft Metal' হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– ক্যালসিয়াম (Ca), গ্যালিয়াম (Ga), টিন (Sn), সীসা (Pb) ইত্যাদি।

✪ **তরল ধাতু (Liquid Metals):** 'তরল ধাতু' বলতে এমন ধাতুকে বোঝায়, যা সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় (প্রায় ২৫°C) তরল অবস্থায় থাকে অথবা সামান্য উত্তাপে তরলে পরিণত হয়। **পারদ বা মার্কারি (Hg) একমাত্র ধাতু যা স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে**। এর গলনাঙ্ক –৩৮.৮৩°C। এছাড়া আরও কিছু ধাতু স্বল্প গলনাঙ্কের কারণে সহজে তরলে পরিণত হয়–

- **গ্যালিয়াম (Ga):** গলনাঙ্ক ২৯.৮°C, হাতে ধরলে গলে যায়।
- **সিজিয়াম (Cs):** গলনাঙ্ক ২৮.৫°C, একটি অতি সক্রিয় ক্ষার ধাতু।
- **ফ্রান্সিয়াম (Fr):** গলনাঙ্ক প্রায় ২৭°C, একটি বিরল ও তেজস্ক্রিয় মৌল।

এদের মধ্যে শুধু পারদই স্বাভাবিকভাবে তরল, বাকিরা উত্তাপে তরল হয়।

ক্ষারক ও ক্ষার (Base & Alkali)

ক্ষার ও ক্ষারক প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। নিচে তা আলোচনা করা হলো–

ক্ষারক (Base)

ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডকে ক্ষারক বলে। এরা অ্যাসিডের দানকৃত প্রোটন গ্রহণ করে এবং অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এরা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দেয়। উদাহরণ– সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) ইত্যাদি। ক্ষারক সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ নিচে দেওয়া হলো–

✪ **অ্যারহেনিয়াসের মতবাদ:** যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে OH^- আয়ন দান করে তাদেরকে ক্ষারক বলে। যেমন– এই মতবাদ অনুযায়ী $NaOH$ একটি ক্ষারক।

$$NaOH\ (aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-\ (aq)$$

✪ **ব্রনস্টেড-লাউরির মতবাদ বা প্রোটনীয় মতবাদ:** সে সমস্ত যৌগ বা আয়ন প্রোটন গ্রহণ করে তারা হলো ক্ষারক। যেমন– NH_3 ও Cl^- উভয়ই ক্ষারক।

$$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$$
$$Cl^- + H^+ \rightarrow HCl$$

✪ **লুইস মতবাদ বা ইলেকট্রনীয় মতবাদ:** যে সমস্ত যৌগ বা আয়ন ইলেকট্রন জোড় দান করে তারা হলো লুইস ক্ষারক। কয়েকটি লুইস ক্ষারক- NH_3, H_2O, CN^-, OH^- ইত্যাদি।

ব্রন্সটেড-লাউরির মতবাদ অনুসারে H_2O অম্ল ও ক্ষার উভয় ধর্ম প্রদর্শন করে। তাই H_2O কে অ্যাম্ফোটেরিক বা উভধর্মী বলা হয়।

ক্ষার (Alkali)

যে সকল ধাতব হাইড্রোক্সাইড পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় তাদের ক্ষার বলে। যেমন– সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$), পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO), বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Ba(OH)_2$] ইত্যাদি। আবার, যে সকল ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদের ক্ষার বলে। যেমন–

$$NaOH\ (aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-\ (aq)$$
$$NH_4OH\ (aq) \rightarrow NH_4^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

কিন্তু ধাতব অক্সাইড যেমন– ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন (CaO) এ OH^- মূলক নেই, তবে জলীয় দ্রবণে OH^- আয়ন দান করে। এটি পানিতে দ্রবীভূত না হওয়ায় এটি শুধু ক্ষারক, ক্ষার নয়।

$$NH_3\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow NH_4OH\ (aq)$$
$$CaO\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (aq)$$

এখানে NH_3 (অ্যামোনিয়া) ও CaO (কুইক লাইম বা চুন) শুধু ক্ষারক এবং NH_4OH ও $Ca(OH)_2$ ক্ষারক ও ক্ষার উভয়ই। আবার, CuO, FeO, $Fe(OH)_2$, FeO, Fe_2O_3, $Al(OH)_3$ এর প্রত্যেকেই ক্ষারক। পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এরা ক্ষার নয়। সেহেতু আমরা বলতে পারি, **সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়।** তবে এরা অনেক ক্ষেত্রে পানিতে অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে মৃদু ক্ষার হিসেবেও আচরণ করতে পারে।

পানির অ্যালকালিনিটি (ক্ষারত্ব): পানির অ্যালকালিনিটি ঘটে পানিতে কার্বনেট (CO_3^{2-}), বাইকার্বনেট (HCO_3^-) ও হাইড্রক্সাইড (OH^-) আয়নের মতো কিছু ক্ষারীয় পদার্থের উপস্থিতির কারণে। এই পদার্থগুলো পানির pH (অ্যাসিডিটি/ক্ষারীয়তা) পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে বা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। চুনাপাথর এবং ডলোমাইট সমৃদ্ধ শিলা থেকে খনিজ পদার্থ পানিতে মিশ্রিত হলে অ্যালকালিনিটি বাড়ে।

অ্যামিন, অ্যামাইড ও এস্টার

অ্যামিন (Amines)

অ্যামিনকে অজৈব যৌগ অ্যামোনিয়ার জৈব জাতক বলা হয়। অ্যামোনিয়ার (NH_3) এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যালকাইল মূলক (C_nH_{2n+1}–বা R) বা অ্যারাইল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগ তৈরি হয় তাকে অ্যামিন বলে। যেমন– মিথাইল অ্যামিন (CH_3-NH_2), অ্যানিলিন ($C_6H_5 – NH_2$) ইত্যাদি।

অ্যারাইল মূলক: বেনজিন (C_6H_6) যৌগের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারণ করলে যে মূলক তৈরি হয় তাকে অ্যারাইল মূলক (C_6H_5–) বলে।

অ্যামিনের নাম	ব্যবহার
মিথাইল অ্যামিন (CH_3–NH_2) ও ডাইমিথাইল অ্যামিন (CH_3–NH–CH_3)	• চামড়া শিল্পে লোমনাশক হিসেবে। • মিথাইল অ্যামিন পঁচা মাছে দুর্গন্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী।
ইথাইল অ্যামিন (C_2H_5–NH_2)	• মরিচা বিরোধী রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে।
হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন (NH_2–$(CH_2)_6$–NH_2)	• কৃত্রিম তন্তু 'নাইলন' তৈরিতে।
ফিনাইল অ্যামিন	• নানা ধরনের রঞ্জক ও সালফা ড্রাগ তৈরিতে।

অ্যামাইড (Amides)

এস্টার ও অ্যামোনিয়া অথবা অ্যামিনের মধ্যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব যৌগকে অ্যামাইড বলে। যেমন– জীবের প্রোটিন, নাইলন, প্যারাসিটামল (অ্যাসিট্যামিনোফেন) ইত্যাদি।

এস্টার (Esters)

জৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব যৌগকে এস্টার বলে। এটি কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের একটি জাতক। এস্টারের সাধারণ সংকেত R-COOR। এরা সুগন্ধিযুক্ত এবং ফল ও ফুলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী। যেমন–

এস্টারের নাম	প্রাপ্তিস্থান	এস্টারের নাম	প্রাপ্তিস্থান
অ্যামাইল অ্যাসিটেট বা ইথানয়েট/ পেন্টাইল অ্যাসিটেট বা ইথানয়েট	পাকা কলা	**বেনজাইল অ্যাসিটেট**	জেসমিন ফুল
অক্টাইল অ্যাসিটেট	পাকা কমলা	**মিথাইল বিউটানয়েট**	আপেল
বিউটাইল বিউটারেট	পাকা আনারস	**বিউটাইল অ্যাসিটেট**	মধু
৩– মিথাইল বিউটাইল ইথানয়েট	নাশপাতি	**ইথাইল আইসোভ্যালিরিয়েট**	কাঁঠাল
ইথাইল ফরমেট	লেবু	**প্রপাইল হেক্সানয়েট**	পনির

✪ **এস্টারের ব্যবহার:**

- তেল, চর্বি, আঠা, সেলুলোজ, রঙ, বার্নিশ ইত্যাদির দ্রাবক হিসেবে এস্টার ব্যবহৃত হয়।
- বিউটাইল অ্যাসিটেট 'পেনিসিলিন'-এর দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- গোলাপের পাঁপড়িতে এস্টার থাকে যা থেকে গোলাপ জল প্রস্তুত করা হয়।
- সংশ্লেষিত এস্টার দিয়ে ফলের সুগন্ধি ও ফলের কৃত্রিম মনোরম স্বাদ তৈরি করা হয়। যেমন–

কৃত্রিম স্বাদ ও সুগন্ধির প্রকৃতি	এস্টার	কৃত্রিম স্বাদ ও সুগন্ধির প্রকৃতি	এস্টার
রাসবেরী	আইসোবিউটাইল ফরমেট	**আনারস**	মিথাইল বিউটাইরেট
কলা	আইসোঅ্যামাইল অ্যাসিটেট	**অ্যাপ্রিকট**	অ্যামাইল বিউটাইরেট
কমলা	অকটাইল অ্যাসিটেট	**আপেল**	আইসো অ্যামাইল ভ্যালেরেট

	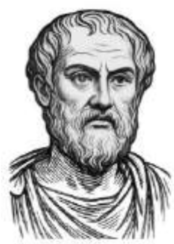			
এরিস্টটল	থিওফ্রাস্টাস	ক্যারোলাস লিনিয়াস	গ্রেগর জোহান মেন্ডেল	লুই পাস্তুর

জীববিজ্ঞানের অবদান আরও কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানী	দেশ	অবদান
কার্ল আর্নস্ট ভন বেয়ার (Karl Ernst von Baer)	রাশিয়া	আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার জনক।
অগাস্ট ভাইজম্যান (August Weismann)	জার্মানি	জার্মপ্লাজম মতবাদের (Germplasm Theory) প্রবক্তা।
হিউগো দ্যা ভ্রিস (Hugo de Vries)	নেদারল্যান্ডস	মিউটেশন মতবাদের (Mutation Theory) প্রবক্তা।
থমাস হান্ট মর্গান (Thomas Hunt Morgan)	যুক্তরাষ্ট্র	জিন মতবাদের (Gene Theory) প্রবক্তা।
জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক (James Watson & Francis Crick)	যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য	DNA-এর ডাবল হেলিক্স গঠন আবিষ্কার করেন।
রবার্ট জি. এডওয়ার্ডস (Robert G. Edwards)	যুক্তরাজ্য	'টেস্টটিউব বেবি' প্রযুক্তির জনক।
ইউশিনোরি ওসুমি (Yoshinori Ohsumi)	জাপান	কোষের অটোফেজি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেন।

ম্যারি ই. ব্রাঙ্কো (Mary E. Brunkow), ফ্রেড রামসডেল (Fred Ramsdell) এবং শিমন সাকাগুচি (Shimon Sakaguchi) যৌথভাবে ২০২৫ সালের ফিজিওলজি বা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' (Peripheral Immune Tolerance) বা দেহের নিরাপত্তাব্যবস্থার 'প্রান্তিক সহনশীলতা' সংক্রান্ত মৌলিক গবেষোণার জন্য তাঁদের এই পুরষকার দেওয়া হয়। কীভাবে ইমিউন সিস্টেম শরীরের নিজস্ব টিস্যুকে আক্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে–তাই তাদের গবেষোণার মূল বিষয় ছিল।
শিমন সাকাগুচি ১৯৯৫ সালে একটি অজানা শ্রেণির ইমিউন কোষ আবিষ্কার করেন (বর্তমানে রেগুলেটরি টি সেল (Tregs) নামে পরিচিত) যেটি অটোইমিউন রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। ম্যারি ই. ব্রাঙ্কো এবং ফ্রেড রামসডেল ২০০১ সালে Foxp3 জিন শনাক্ত করেন, যার মিউটেশনের ফলে IPEX সিনড্রোমের মতো গুরুতর অটোইমিউন রোগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে, সাকাগুচি উপর্যুক্ত দুইটি আবিষ্কারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে দেখান যে, Foxp3 জিনই রেগুলেটরি টি সেলের বিকাশ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।
তাঁদের এই সম্মিলিত আবিষ্কার পেরিফেরাল টলারেন্স গবেষণার আধুনিক যুগের সূচনা করেছে, যা অটোইমিউন রোগ, ক্যান্সার এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

এক নজরে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের জনক			
অ্যারিস্টটল	জীববিজ্ঞানের জনক/প্রাণীবিজ্ঞানের জনক (তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও জনক)	**সিগমুন্ড ফ্রয়েড**	মনোবিশ্লেষণ বা মনোবিজ্ঞানের জনক/মনোসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির জনক
ক্যারোলাস লিনিয়াস	দ্বিপদ নামকরণের জনক	**অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক**	অণুজীববিজ্ঞান/ব্যাকটেরিওলোজির জনক
থিওফ্রাসটাস	উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক	**লুই পাস্তুর**	রোগজীবাণু তত্ত্বের জনক
গ্রেগর জোহান মেন্ডেল	বংশগতিবিদ্যা/জিনতত্ত্বের জনক	**স্ট্যানলি**	ভাইরোলজির জনক
উইলিয়াম হার্ভে	শারীরবিদ্যার জনক	**পল বার্গ**	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জনক
রবার্ট হুক	কোষ বিদ্যার জনক		

এক নজরে বিভিন্ন জীবাণু আবিষ্কারক			
রবার্ট কক	যক্ষ্মা, কলেরা	**হারভে জে. অল্টার**	হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস (মানুষের নীরব ঘাতক)
এডওয়ার্ড জেনার	গুটিবসন্ত	**মন্টানিয়ার ও রবার্ট গ্যালো**	HIV ভাইরাস

২. **গুল্ম (Shrubs):** গুল্ম হলো এমন ধরনের কাষ্ঠল উদ্ভিদ যা গাছের তুলনায় আকারে ছোটো এবং সাধারণত ২ থেকে ৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। গুল্মের কাণ্ড কাষ্ঠল হলেও তা গাছের মতো প্রধান ও উঁচু নয়; বরং মাটির কাছাকাছি থেকে একাধিক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে। এই শ্রেণির উদ্ভিদ ঘন ডালপালায় পরিপূর্ণ এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধের জন্য পরিচিত।
উদাহরণ: জবা, গোলাপ, গন্ধরাজ, লেবু, রঙ্গন ইত্যাদি।

৩. **উপগুল্ম (Under Shrubs):** উপগুল্ম হলো এমন ধরনের কাষ্ঠল বা আধা-কাষ্ঠল উদ্ভিদ যা গুল্মের তুলনায় আরও ছোটো এবং সাধারণত ১ মিটার বা তার কম উচ্চতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এদের শাখা-প্রশাখা গুল্মের মতোই ছড়ানো হলেও গঠন তুলনামূলকভাবে কোমল ও কম শক্তিশালী হয়। এদের জীবনকালও গুল্মের তুলনায় ছোটো বেশিরভাগই এক বা দুই বছরের মধ্যে তাদের পূর্ণ বৃদ্ধি ও প্রজনন সম্পন্ন করে।
উদাহরণ: কাল্কাসুন্দা, আশঁশেওড়া, তুলসী, ল্যাভেন্ডার, পুদিনা, দাদমর্দন ইত্যাদি।

৪. **বীরুৎ (Herbs):** বীরুৎ হলো এমন একপ্রকার অ-কাষ্ঠল উদ্ভিদ যাদের কাণ্ড নরম ও রসাল এবং সাধারণত এক মৌসুমের জন্য জীবিত থাকে। এদের জীবনচক্র খুবই সংক্ষিপ্ত–বীজ অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে ফুল, ফল এবং মৃত্যুর সবকিছু একটি নির্দিষ্ট ঋতুর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। উচ্চতায় এরা সাধারণত খুব কম হয় এবং মাটির কাছাকাছি অবস্থান করে। বীরুৎ শ্রেণির উদ্ভিদ খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও ঔষধি গাছ হিসেবে আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
উদাহরণ: ধান, গম, ভূট্টা, ধনিয়া, সরিষা, দূর্বাঘাস ইত্যাদি।

✪ **আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে বীরুৎকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–**

একবর্ষজীবী উদ্ভিদ (Annual Plants)	দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ (Biennial Plants)	বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ (Perennial Plants)
একবর্ষজীবী উদ্ভিদ হলো এমন ধরনের উদ্ভিদ যারা একটি নির্দিষ্ট মৌসুম বা বছরের মধ্যেই তাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র-বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, ফলধারণ এবং মৃত্যু-সমাপ্ত করে। এরা সাধারণত দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য ও সবজি উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। **উদাহরণ:** ধান (ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ), গম, সরিষা, টমেটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি।	দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ হলো এমন উদ্ভিদ যারা তাদের পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুই বছর সময় নেয়। প্রথম বছরে তারা মূলত শিকড়, কাণ্ড ও পাতার মতো ভেজেটেটিভ অঙ্গ তৈরি করে এবং দ্বিতীয় বছরে তারা ফুল ও ফল উৎপাদন করে এবং এরপর মৃত্যু ঘটে। সাধারণত এই ধরনের উদ্ভিদগুলোতে প্রথম বছর কোনো ফুল দেখা যায় না। **উদাহরণ:** গাজর, পেঁয়াজ, ব্রকলি, মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি।	বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ হলো এমন উদ্ভিদ যেগুলো দুই বছরের বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকে এবং জীবনচক্রে একাধিকবার ফুল ও ফল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এদের জীবনকাল দীর্ঘ-কিছু উদ্ভিদ কয়েক বছর, আবার কিছু প্রজাতি কয়েকশ বছর পর্যন্তও টিকে থাকতে পারে। সাধারণত এই উদ্ভিদগুলো প্রতি মৌসুমে নতুন করে ফুল-ফল দিয়ে থাকে। **উদাহরণ:** রোজমেরি, তুলসী, আদা, হলুদ, দূর্বাঘাস ইত্যাদি।

বেনথাম ও হুকারের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস

উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ বেনথাম (George Bentham) এবং স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (Joseph Dalton Hooker) তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ Genera Plantarum (১৮৬২-১৮৮৩)-এ উদ্ভিদজগতের একটি প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বহুবিধ গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটি তুলনামূলক, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপন করা হয়, যা আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্বে আজও বহুলভাবে গৃহীত ও সমাদৃত। বেনথাম ও হুকার উদ্ভিদজগতকে মূলত দুটি উপজগতে (Sub-Kingdom) বিভক্ত করেন। যথা– উপজগৎ ১: অপুষ্পক উদ্ভিদ (Cryptogamia) ও উপজগৎ ২: সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogamia)।

জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি বোর্ড বই		উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র. *আবুল হাসান*	
ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট			
১০টি। যথা–		**৯টি। যথা–**	
নাইট্রোজেন (N)	পটাশিয়াম (K)	নাইট্রোজেন (N)	পটাশিয়াম (K)
ফসফরাস (P)	ক্যালসিয়াম (Ca)	ফসফরাস (P)	ক্যালসিয়াম (Ca)
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	কার্বন (C)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	কার্বন (C)
হাইড্রোজেন (H)	অক্সিজেন (O)	হাইড্রোজেন (H)	অক্সিজেন (O)
সালফার (S)	লৌহ (Fe)	সালফার (S)	
অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া সব কয়টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে।			
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট			
৬ টি। যথা–		**৮টি। যথা–**	
দস্তা বা জিংক (Zn)	ম্যাংগানিজ (Mn)	দস্তা বা জিংক (Zn)	ম্যাংগানিজ (Mn)
মোলিবডেনাম (Mo)	বোরন (B)	মোলিবডেনাম (Mo)	বোরন (B)
তামা বা কপার (Cu)	ক্লোরিন (Cl)	তামা বা কপার (Cu)	ক্লোরিন (Cl)
		লৌহ (Fe)	নিকেল (Ni)
মোট: ১৬টি।		**মোট: ১৭টি।**	

উদ্ভিদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলো মনে রাখার জন্য একটি সহজ mnemonic হলো– My Kind Cat Feeds Nice CHOPS.

My	**Kind**	**Cat**	**Feeds**	**Nice**	**CHOPS**				
Mg	K	Ca	Fe	N	C	H	O	P	S

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

উদ্ভিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। এ লক্ষণগুলোকে অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency Symptoms) বলা হয়। নিম্নে উদ্ভিদের কিছু পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো–

পুষ্টি উপাদান	অভাবের লক্ষণ
নাইট্রোজেন (N)	▪ নাইট্রোজেনের অভাবে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ▪ ক্লোরোফিলের অভাবে পাতা হলুদ হয়ে যায়, যাকে ক্লোরোসিস বলা হয়। ▪ কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন হ্রাস পায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।
ফসফরাস (P)	▪ পাতা বেগুনি হয়ে যায়। ▪ মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়, পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে। ▪ উদ্ভিদ খর্বাকার হয়ে যায়।
পটাশিয়াম (K)	▪ পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল তৈরি হয়। ▪ পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থান হলুদ হয়ে যায়। ▪ পাতা কুঁকড়ে আসে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।
ক্যালসিয়াম (Ca)	▪ কচি পাতায় ক্লোরোসিস হয়। ▪ পাতা কুঁকড়ে যায়, পাতার কিনারা বরাবর অঞ্চল মরে যায়। ▪ ফুল ফোটার সময় কাণ্ড হঠাৎ শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	▪ ক্লোরোফিল তৈরি না হওয়ায় পাতার সবুজ রং হালকা হয়ে যায়। ▪ সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। ▪ পাতার শিরার মধ্যবর্তী অংশে ক্লোরোসিস হয়।

বিভিন্ন রোগ নির্ণায়ক যন্ত্র

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে রোগ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়, যা সময়মতো সঠিক চিকিৎসা গ্রহণে সহায়তা করে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এসব যন্ত্র আরও উন্নত ও কার্যকর হয়ে উঠছে, ফলে মানবদেহের সুস্থতায় এগুলোর অবদান অপরিসীম। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয় যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

এক্সরে (X-Ray) 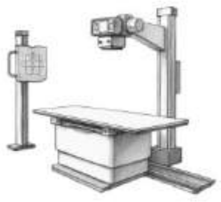	১৮৮৫ সালে *(উৎস: নবম-দশম শ্রেণি বিজ্ঞান, এনসিটিবি)* মতান্তরে ১৮৯৫ সালে *(উৎস: পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি, বাউবি)* উইলহেলম রন্টজেন এটি আবিষ্কার করেন যা মাংশপেশি ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারে। এক্স-রে- এর অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন শরীরে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা হিসেবে এক্সরে নেয়ার সময় নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া শরীরের বাকি অংশ সিসার তৈরি অ্যাপ্রোন দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। সাধারণত খুব প্রয়োজন ছাড়া গর্ভবতীদের এক্সরে করা হয় না। **ব্যবহার:** ▪ হাড় ভাঙা, দাঁতের ক্ষয়, পিত্তথলি ও কিডনির পাথর, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার প্রভৃতি নির্ণয়ে এটি ব্যবহৃত হয়। ▪ বুকের এক্সরে করে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা দেখা হয়। ▪ বেরিয়াম এক্সরের মাধ্যমে খাদ্যনালির রোগ যেমন-আলসার, অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করা হয়। ▪ এটি ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে বলে রেডিওথেরাপিতে এক্স-রে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।
মেমোগ্রাফি (Mammography)	স্তন ক্যান্সারসহ স্তনের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য কম-শক্তির এক্স-রে ব্যবহার করে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে মেমোগ্রাফি বলে।
আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography) 	এ পরীক্ষায় উচ্চ কপাঙ্কের শব্দ তরঙ্গের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে ইমেজিং করে শরীরের ভিতরের অঙ্গ, মাংসপেশির ছবি তোলা হয়। এ শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ১-১০ মেগাহার্টজ। **ব্যবহার:** ▪ প্রসূতির গর্ভে ভ্রূণের অবস্থান, গঠন, আকার জানার পাশাপাশি জরায়ুর টিউমার ও অন্যান্য পেলভিক রোগসমূহ নির্ণয় করা যায়। ▪ টিউমার, পিত্তপাথর, হৃদপিণ্ডের ত্রুটি প্রভৃতি জানার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি এক্সরের তুলনায় নিরাপদ। উল্লেখ্য হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য শব্দতরঙ্গ তথা আলট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহার করা হলে তাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলে।
সিটি স্ক্যান (CT Scan) [CT = Computed Tomography] 	'টমোগ্রাফি' শব্দের অর্থ হলো ত্রিমাত্রিক বস্তুর দ্বিমাত্রিক অংশের ছবি তৈরি করা। সিটি স্ক্যান হলো এমন একটি আধুনিক যন্ত্র, যেখানে এক্স-রে ব্যবহার করে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদ ও পর্যায়ক্রমিক ছবি তৈরি করা হয়। **ব্যবহার:** ▪ নরম টিস্যু, ফুসফুস, শিরা-ধমনি, মস্তিষ্কের পূর্ণাঙ্গ ছবি নেয়ার জন্য। ▪ যকৃৎ, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার শনাক্তে এবং টিউমার শনাক্তের কাজে সিটি স্ক্যান করা হয়। ▪ সিটি স্ক্যান দিয়ে মস্তিষ্কে রক্তপাত, ধমনি ফোলা বা টিউমার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ▪ শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কিনা সেটিও সিটি স্ক্যান করে জানা যায়। **সর্তকতা:** সিটিস্ক্যান করার জন্য যেহেতু এক্স-রে ব্যবহার করা হয়, তাই গর্ভবতী নারীদের সিটিস্ক্যান করা হয় না। ছবির কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্যে যে 'রং' ব্যবহার করা হয় সেটি কারো কারো শরীরে এলার্জির জন্ম দিতে পারে বলে সেটি ব্যবহার করার আগে সর্তক থাকতে হয়।

খাদ্য জালে সব জীব একে অপরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদক সূর্যালোক ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে। উৎপাদকের উপরে প্রথম শ্রেনির খাদক অর্থাৎ তৃণভোজীরা নির্ভর করে। এই তৃণভোজীদের ভক্ষণ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদকরা। আর তাদের শিকার করে তৃতীয় স্তরের খাদকরা। প্রতিটি স্তরের প্রাণী মৃত্যুর পরে পচনকারী অণুজীবরা তাদের দেহ ভেঙে পরিবেশে পুষ্টি ফিরিয়ে দেয়। এভাবে খাদ্য জাল প্রকৃতিতে শক্তি চক্র ও প্রবাহ সুনিশ্চিত করে।

অন্যদিকে, খাদ্য জালের জীবেরা নানা স্তরে সংগঠিত হয় এবং শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের প্রবাহ নির্দিষ্ট স্তরভিত্তিক বিন্যাস তৈরি করে। এই স্তরভিত্তিক বিন্যাসকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলা হয়।

ইকোলজিক্যাল পিরামিড

ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন স্তরের জীবের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের সংখ্যা বা বায়োমাসের বিন্যাসকে বোঝাতে ইকোলজিক্যাল পিরামিড ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেখা যায়, একটি ইকোসিস্টেমে উৎপাদকের (সবুজ উদ্ভিদ) তুলনায় প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম থাকে, আবার প্রাথমিক খাদকের তুলনায় সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা কম এবং সেকেন্ডারি খাদকের তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হয়। এভাবে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরের জীবের সংখ্যা বা শক্তি হ্রাস পেয়ে পিরামিডের আকৃতি ধারণ করে। এই পিরামিড আকৃতির বিন্যাসকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলা হয়।

✪ **ইকোলজিক্যাল পিরামিডের বিভিন্ন ধরন নিম্নে দেওয়া হলো–**

১. **সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Numbers):** এ ধরনের পিরামিডে প্রতিটি স্তরে জীবের সংখ্যা দেখানো হয়। সাধারণত উৎপাদকদের সংখ্যা বেশি থাকে, প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম এবং ক্রমান্বয়ে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম থাকে।

২. **বায়োমাসের পিরামিড (Pyramid of Biomass):** এ পিরামিডে প্রতিটি স্তরে জীবের মোট বায়োমাস বা জৈব পদার্থের পরিমাণ দেখানো হয়। উৎপাদকদের মোট বায়োমাস সবচেয়ে বেশি হয় এবং প্রতিটি পরবর্তী স্তরে বায়োমাসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

৩. **শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy):** একটি ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট এলাকাতে এবং নির্দিষ্ট সময়কালে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের জীব কর্তৃক ব্যবহৃত মোট শক্তির হিসাব অনুযায়ী অঙ্কিত নকশাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়।

কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকায় এক বছর সময়কালে প্রথম খাদ্যস্তরের জীব তথা উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে, তা দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। আবার দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি তৃতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। চতুর্থ স্তরের জীব সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে। শক্তির এই প্রবাহ সব সময়েই একমুখী। এ শক্তিপ্রবাহকে কখনো বিপরীতমুখী করা যায় না।

সূর্য (The Sun)

সূর্য একটি অগ্নিসদৃশ গ্যাসীয় গোলক যা সৌর জগতের প্রাণকেন্দ্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ অন্য সাতটি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে। নিম্নে সূর্য সম্পর্কিত তথ্যগুলো ছক আকারে দেওয়া হলো–

গঠন	হাইড্রোজেন (৫৫%), হিলিয়াম (৪৪%)
অবস্থা	প্লাজমা
জ্বালানির উৎস	নিউক্লিয়ার ফিউশন (হাইড্রোজেন $\rightarrow$ হিলিয়াম)
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা	প্রায় ৬,০০০° সেলসিয়াস
কেন্দ্রের তাপমাত্রা	প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস
ব্যাস	প্রায় ১৩.৮৪ লক্ষ কিলোমিটার
ভর	প্রায় ১.৯৯ × ১০^{৩০} কেজি
পৃথিবীর তুলনায় আকার	প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়
চাঁদের তুলনায় আকার	প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ গুণ বড়
পৃথিবীতে পৌঁছানো তাপের পরিমাণ	সূর্যতাপের ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ
পৃথিবীতে আলো ও তাপ পৌঁছানোর সময়	৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট বা ৫০০ সেকেন্ড
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	প্রায় ২৫ দিন
পৃথিবীতে আগত শক্তি	পৃথিবীর মোট শক্তির ৯৯.৯৭% আসে সূর্য থেকে।

সৌর জগতের আটটি গ্রহ

বুধ (Mercury)

বুধ সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট ও সূর্যের নিকটতম গ্রহ। বুধে কোন বায়ুমণ্ডল, পানি, মেঘ, বৃষ্টি, জীব ও উপগ্রহ নেই।

নামকরণ	রোমান পুরাণে মার্কারি (Mercury) হলো দেবতাদের দূত ও বাণিজ্যের দেবতা
সূর্য থেকে অবস্থান	১ম (নিকটতম গ্রহ)
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	৫.৮ কোটি কিলোমিটার
ব্যাস	৪,৮৫০ কিলোমিটার
দিনের তাপমাত্রা	প্রায় ৪০০° সেলসিয়াস
রাতের তাপমাত্রা	হিমাঙ্কের নিচে
বছর (সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়)	৮৮ দিন

শুক্র (Venus)

শুক্র পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ (সূত্রঃ NASA)। শুক্রকে পৃথিবীর জমজ গ্রহ বলা হয়। গ্রহটিতে পৃথিবীর মতো পাহাড়, সমতল ভূমি, আগ্নেয়গিরি আছে। এর কোন উপগ্রহ নেই। এ গ্রহের বায়ুমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন (অ্যাসিড বৃষ্টি হয়) ও কার্বন ডাই অক্সাইডের তৈরি বলে তাপ ধরে রাখে। ফলে এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উষ্ণতম গ্রহ। অন্য সব গ্রহ পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করলেও শুক্র পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করে।পৃথিবীর নিকটতম এই গ্রহকে আমরা ভোরে পূর্বাকাশে শুকতারা ও সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা হিসেবে দেখে থাকি।

নামকরণ	শুক্রগ্রহের (Venus) নাম রাখা হয়েছে প্রাচীন রোমান প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস-এর নামে। এটি একমাত্র গ্রহ যার নাম কোনো নারী দেবীর নামে রাখা হয়েছে।
সূর্য থেকে অবস্থান	২য়
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	১০.৮ কোটি কিলোমিটার
ব্যাস	১২,১০৪ কিলোমিটার
বছর (সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়)	২২৫ দিন

মহাজাগতিক কণাঃ ফার্মিওন ও বোসন (Cosmic Particles : Fermions and Bosons)

মহাবিশ্বের সকল কণাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়– ফার্মিওন (Fermion) ও বোসন (Boson)।

১. **ফার্মিওন** হলো মহাবিশ্বের সকল পদার্থ গঠনকারী মৌলিক কণা, যাদের স্পিন $\frac{১}{২}$। এগুলো পাউলির বর্জন নীতি (Pauli's Exclusion Principle) মেনে চলে এবং প্রতিটি ফার্মিওনের একটি প্রতিকণা (Antiparticle) রয়েছে। প্রতিকণা হলো কোনো কণার সমান ভর ও বিপরীতধর্মী কণা, যা পরস্পরের সাথে মিলিত হলে পদার্থ বিলুপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।

ফার্মিওন আবার দুই প্রকার–

- **কোয়ার্ক (Quark):** কোয়ার্ক মূলত ছয় ধরনের; যথা– আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ ও বটম। কয়েকটি কোয়ার্ক দলবদ্ধ হলে সেটিকে বলা হয় হ্যাড্রন (Hadron)। তিনটি কোয়ার্ক নিয়ে গঠিত হ্যাড্রনকে বেরিয়ন (Baryon) বলে; যেমন– প্রোটন ও নিউট্রন। একটি কোয়ার্ক ও একটি এন্টিকোয়ার্ক নিয়ে গঠিত হ্যাড্রনকে বলে মেসন (Meson); যেমন– π মেসন, K মেসন।
- **লেপ্টন (Lepton):** ছয় ধরনের লেপ্টনের মধ্যে ইলেকট্রন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন। পজিট্রন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী পল ডিরাক ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী হারম্যান ভাইল ভরহীন কণা 'ভাইল ফার্মিওন' এর ধারণা দেন। ৮৫ বছর পর ২০১৫ সালে বাংলাদেশি পদার্থবিজ্ঞানী ড. জাহিদ হাসানের নেতৃত্বে বাস্তবে পরীক্ষাগারে তা শনাক্ত করা হয়।

২. **বোসন** হলো এমন কণা, যাদের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই মহাবিশ্বের মৌলিক বলসমূহ কাজ করে। এদের স্পিন ০, ১ ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা। বোসন কণা পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে না এবং এগুলোর কোনো প্রতিকণা নেই।

বোসন দুই ধরনের–

- **গেজ বোসন (Gauge Boson):** গ্লুওন (g), ফোটন (γ), W ও Z বোসন হলো গেজ বোসন। এদের স্পিন ১। গ্লুওন সবল নিউক্লিয় বল, ফোটন তাড়িতচৌম্বক বল এবং W ও Z বোসন দুর্বল নিউক্লিয় বল বহন করে।
- **হিগস বোসন (Higgs Boson):** হিগস বোসনের স্পিন ০। এর প্রধান কাজ হলো মৌলিক কণাকে ভর প্রদান করা।

হিগস বোসন কণা (Higgs Boson Particle)

১৯৬৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস একটি বিশেষ কণার ধারণা দেন, যা অন্য মৌলিক কণাগুলোকে ভর প্রদান করে এবং যার মাধ্যমেই মহাবিশ্বের গঠন সম্ভব হয়েছে। এই কণা নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া ইংলার্ট ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিজ্ঞানী হিগস মূলত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'কণা পরিসংখ্যান তত্ত্ব' (Quantum Statistics) থেকে সাহায্য নিয়ে এই কণার ধারণা দেন বিধায় এর নামকরণ করেন 'হিগস-বোসন কণা' (Higgs Boson Particle)। পরে ১৯৯৩ সালে বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান এই হিগস বোসন কণাটির নাম দেন 'ঈশ্বর কণা' (God Particle)। ২০১২ সালের ৪ জুলাই সুইজারল্যান্ডের সার্ন (CERN) গবেষণাগারের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে (LHC) বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো হিগস বোসন কণা আবিষ্কার করেন, যা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বশেষ মৌলিক বোসন কণা।
উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে, গ্রাভিটন (Graviton) নামের একটি বোসন কণা মহাবিশ্বের মহাকর্ষ বলের সৃষ্টি করে বলে ধারণা করা হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে (Cosmic Ray)

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চার্জিত কণার (প্রধানত প্রোটনের) প্রবাহকে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে (Cosmic Rays) বলে। এটি কোনো সাধারণ আলোকরশ্মি বা তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ নয়; বরং এক ধরনের তেজস্ক্রিয়তা। 'কসমিক রে' নামটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকেন। ১৯৩৬ সালে এই মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস, অপর বিজ্ঞানী ডেভিড আন্ডারসনের সাথে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মহাকাশ অনুসন্ধান ও অভিযানসমূহ

মহাকাশ গবেষণা (Space Research)

মহাবিশ্বের গঠন, সৃষ্টি, বিবর্তন ও জ্যোতিষ্কসমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে যে গবেষণা পরিচালিত হয়, তাকে মহাকাশ গবেষণা বলে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্র ও বিদ্যার প্রয়োগ ঘটে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান, বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি ইত্যাদি। এসব শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও আবিষ্কার মানুষের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বোঝার ক্ষমতাকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করেছে।

✪ **গ্রিনহাউজ গ্যাস:** উল্লেখযোগ্য গ্রিনহাউজ গ্যাস হলো– কার্বন ডাই-অক্সাইড (প্রধান), মিথেন, জলীয় বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। কার্বন ডাই-সালফাইড ও কার্বনিল সালফাইড পরোক্ষ গ্রিনহাউজ গ্যাস। বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। এছাড়াও শিল্প খাত, পরিবহন খাত, ভবন নির্মান থেকেও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গত হয়।
পরিবেশ দূষণ ও গাছপালা কেটে ফেলার কারণে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। শিল্পকারখানা ও যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রিনহাউজ গ্যাস	বায়ুতে পরিমাণ (%)	তুলনামূলক গ্রিনহাউজ প্রভাব
CO_2 গ্যাস	৫০%	১ গুণ
CH_4 গ্যাস	১৯%	২৫ গুণ
N_2O	৫%	২৭০ গুণ
CFC গ্যাস	১৬%	১৫,০০০ গুণ
ওজোন O_3	৮%	১০ গুণ
জলীয় বাষ্প	২%	৫ গুণ কম

✪ **গ্রিনহাউজ ইফেক্টের প্রভাব:** গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখে।

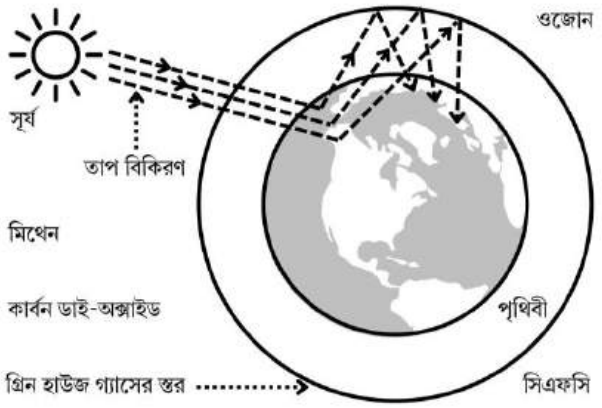

চিত্র: গ্রিন হাউজ ইফেক্ট।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। এটি মূলত গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলে ঘটে থাকে। শিল্পায়ন, বন উজাড়, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং অন্যান্য মানবসৃষ্ট কার্যকলাপের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী।

✪ **বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবসমূহ নিচে দেওয়া হলো–**

- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া এবং জীববৈচিত্র্য-এর উপর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বিগত ১০০ বছরে প্রায় ০.৬ (মতান্তরে ০.৭৪) ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। একুশ শতকের শেষে গড় তাপমাত্রা আরও ২.৫ থেকে ৫.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে।
- বিশ্বে বিগত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার।
- গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নিম্নভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেমি (মতান্তরে ৩ ফুট) বাড়লে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী প্রায় ১৭% (১০-১৫%) ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে এবং ৩ কোটি (৩.৫ কোটি) মানুষ জলবায়ু শরণার্থীতে (Climate refugee) পরিণত হবে। এছাড়াও লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রবল বন্যা, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, নতুন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি প্রভৃতি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলাফল।
- বরফে আচ্ছাদিত দেশে চাষাবাদের নতুন জমির প্রাপ্যতা বাড়লেও পৃথিবীর প্রায় ৪০% এলাকায় বসবাসকারী পুরো বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২০% মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।